আলোয় ভালোয় অন্যরকম অমরেন্দ্র

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী খানিক বড়দের, অনেকাংশেই ছোটদের। প্রথম জীবনে বড়দের নিয়ে ভেবেছেন বেশি। পরে মুখ্যত ছোটদের জগতে তাঁর চলাচল। ছোটদের লেখায় স্বর্ণসম্ভার, একের পর এক মনে রাখার মতো ছোটদের বই লিখেছেন। অপ্রতিরোধ্য তিনি, আশির কাছাকাছি পৌঁছেও রচনাধারা তাঁর অব্যাহত। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সৃষ্টিকর্মে সতত সক্রিয়। যিনি পারেন, তিনি সবই পারেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীও পেরেছেন। ছোটদের, বড়দের দুই জগতেই তাঁর অনায়াস যাতায়াত, সাবলীল পদক্ষেপ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী 'কবিতা-পরিচয়'-এর মতো কবিতাকেন্দ্রিক আলোচনার একটি অপূর্ব পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, নিজেও কবিতা লিখতেন, আবার পাশাপাশি কথাসাহিত্যের চর্চা। পরেও সাবালকপাঠকের কথা ভেবে কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন এমনকী 'বিষাদগাথা' ও 'জিপসি রাত'-এর মতো উপন্যাসও। সাবালকপাঠ্য সাহিত্য যৎসামান্য, বালকপাঠ্য সাহিত্যই তিনি লিখেছেন অধিক পরিমাণে। ভ্রমণসাহিত্যের চর্চাও করেছেন। ভ্রমণবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা প্রকাশের কথা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীই প্রথম ভেবেছেন। চাকরির সন্ধান, সেইসঙ্গে কর্মমুখী করে তোলার চেষ্টা— এমনতরো ভাবনা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার কথা তাঁর আগে কেউ ভাবেননি। দু'টি পত্রিকাই বাণিজ্যিকভাবে সফল, হয়েছে জননন্দিত।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী স্বপ্ন দেখতে বরাবরই ভালোবাসেন। তিনি স্বপ্নদর্শী। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মেয়েদের দৈনিক প্রকাশে একদা অগ্রণী হয়েছিলেন। মনোবল যতই অদম্য হোক না কেন, শুধু মনোবলকে পুঁজি করে দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখা যায় না। এক্ষেত্রেও ঘটেছে বিপর্যয়, অকালমৃত্যু। ছোটদের কথা ভেবে প্রথমে ট্যাবলয়েড, পরে 'ছেলেবেলা' পত্রিকাকারে প্রকাশ করেও বাঁচাতে পারেননি। 'ছেলেবেলা' ঘোষণা করে বন্ধ হয়ে গেলেও 'কালের কষ্টিপাথর' নামে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সিরিয়াস পাঠকের জন্য যে পত্রিকাটি বের করেছিলেন, সেটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যা প্রকাশের সময়গত ব্যবধান দীর্ঘায়িত হয়েছে। বন্ধ হয়ে যায়নি, বাঁচিয়ে রাখার জন্য অমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছেন। সেটাই বড় কথা।

পত্রিকা সম্পাদনার ব্যস্ততা কম নয়, পর্যটনেও ব্যস্ত থাকতে হয়। জাগতিক সব ব্যস্ততা দূরে সরিয়ে ছোটদের জন্য কলম ধরতে পারলেই যে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী স্বস্তি অনুভব করেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের মনও ভরে ওঠে প্রাপ্তির আনন্দে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছোটদের কথা ভেবে অন্তত ষোল-সতেরোটি বই লিখেছেন। কেউ বলবেন তিনি 'হীরু ডাকাত'-এর, হয়তো কেউ বলবেন 'শাদা ঘোড়া'-র। ছোটদের সাহিত্যজগতে তাঁর সম্ভ্রমের আসন, সে-আসন সহসা আসেনি, অর্জন করতে হয়েছে তাঁকে। উল্লিখিত দু'টি বই তাঁকে বাড়তি খ্যাতি দিয়েছে, এ কথা সত্য, তা সত্ত্বেও বলতে হয়, সুনির্দিষ্ট দু'তিনটি বইয়ে নয়, শিশুসাহিত্যের অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে জানতে, বুঝতে গেলে ছোটদের জন্য লেখা তাঁর অন্যান্য বইগুলোও দেখতে, পড়তে হবে। ওই সুপ্রচলিত দু'টি বইয়ে পুরো নয়, পাওয়া যাবে খণ্ডিত অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে। বৈচিত্র্যে ভরপুর তাঁর শিশুসাহিত্যের জগৎ। গদ্যপদ্যের এক আশ্চর্য সহাবস্থান। ছোটদের ছড়া খুব সামান্যই লেখা হয় অধিকাংশই পদ্য, না-ছড়া, না-কবিতা। আমরা ধ্বনিমাধুর্যের জন্যই 'গদ্যপদ্য' শব্দটি ব্যবহার করলাম মাত্র। পদ্য নয়, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন নিটোল কবিতা। যেমন লিখতেন বুদ্ধদেব বসু। গদ্য, ছোটদের জন্য লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসও বৈচিত্র্যে ভরপুর। শুনিয়েছেন মানবিকতায় উজ্জ্বল কাহিনিমালা। আবার, কখনও তিনি রচনা করেছেন মায়াবী রূপকথা। রূপকথার চেনা পথের অবশ্য পদাতিক নন তিনি, তাঁর পথ ভিন্নতর। সে-পথ আধুনিকতার আলোয় উজ্জ্বল। মন-ছোঁয়া, মন-কেমন করা গল্প যেমন লিখেছেন, তেমনই লিখেছেন ছেঁড়াকাঁথার গল্প। অভাবী মানুষের দুঃখের বারোমাস্যা, তাদের বেঁচেবর্তে থাকা, দারিদ্রযন্ত্রণার কথাও এসেছে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পে। বনের পশু পাখি বনে থাকেনি, ঠাঁই নিয়েছে মনের কোণে। তাদের সঙ্গে ছোটদের ভাবসাব হোক, সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হোক, চেয়েছেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে হরিণের সঙ্গে খেলা ছোটদের চলতেই থাকে। 'পাখির খাতা'-য় তিনি লিখে রাখেন পক্ষিজগতের কত না আশ্চর্য বিবরণ! সেলিম আলি বা অজয় হোমসুলভ নয়, তথ্যের সুলুকসন্ধান তাঁর কাজ নয়, সে-কাজে ব্রতীও হননি। নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকে পাখিদের তিনি চিনেছেন, চিনিয়েছেন। সেই চেনার ভিত্তিতে তাঁর মনে হয়েছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মানুষের চেয়ে পাখিরাই বেশি বোঝে। পাখিদের নিয়ে কৌতূহল-জাগানিয়া এমনতরো গল্প 'পাখির খাতা'-র পাতায় পাতায় ধরা রয়েছে। পড়তে পড়তে ওই জগতের সঙ্গে ভালোবাসার এক বন্ধন তৈরি হয়। গড়ে ওঠে সখ্য। এ-সবই যে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সচেতন প্রয়াস, তা বলাই বাহুল্য। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কখনও সুলভ ভূতের গল্প, গোয়েন্দা গল্প ফাঁদেননি। চিরায়ত শিশুসাহিত্যের যে ধারা, সে-ধারার আধুনিকীকরণ ঘটেছে তাঁর হাতে। ছোটদের মধ্যে শুভবোধ জাগাতে চেয়েছেন। জেগে উঠেছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, গভীর মানবিকতা। এই চেনা গণ্ডিতেই তিনি শুধু ঘুরপাক খাননি, নানা বিষয়ের গল্প লিখেছেন। অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ছোটদের দুর্নিবার আকর্ষণ। বিভূতিভূষণ দেশান্তরে, সুদূর আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্করকে। হেমেন্দ্রকুমার

রায়ের লেখায় অসীম সাহসী, অপরিসীম মনোবলের অধিকারী কিশোর-চরিত্রের সন্ধান মেলে। দেখি সুনির্মল বসুর রচনাতেও। সুনির্মল বসু নিয়ে গিয়েছিলেন টাঙ্গানিকা অঞ্চলে। তাঁর 'রোমাঞ্চের দেশে' পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত না-হয়ে পারা যায় না! অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর হাত ধরে কিশোর-মন পৌঁছে যায় 'আমাজনের জঙ্গলে', কখনও 'বরফের বাগান'-এ। বরফে ঢাকা এই বাগান কোথায়, সেই সুদূর আন্টার্কটিকায়! ভাবা যায়! বিভূতিভূষণ আফ্রিকার কথা শুনিয়েছিলেন আফ্রিকা ফেরত কয়েকজনের অভিজ্ঞতার নিরিখে। শুধু শ্রুত অভিজ্ঞতা-বিবরণ নয়, রকমারি বিলিতি জার্নাল থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। বানানো বর্ণনা নয়, দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো মানুষটির অভিজ্ঞতা অপরিসীম। পায়ের তলায় সর্ষে, কোথায় যাননি তিনি!

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্প-উপন্যাস নিয়ে পরে, হয়তো আরও দু'কথা শোনানো যাবে। আপাতত তাঁর ছড়া-কবিতার প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। যিনি কবি, যাঁর হাতে কবিতা আছে, তিনিই যে ছোটদের জন্য ভালো কবিতা লিখবেন, তা নয়। সকলে না হলেও সাবালকপাঠ্য কবিতা রচনায় অভ্যস্ত কবিদের কেউ কেউ বালকপাঠ্য কবিতাতেও পারঙ্গম, ছোটদের কবিতা-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত।

বিশুদ্ধ ছড়ার বরাবরই আকাল। কবিদের হাতে ছড়াও প্রায়শই 'কবিতা' হয়ে ওঠে। অনেক সময়ই ছড়ার ছন্দে লেখা, অথচ ভাবে ভাবনায় উপস্থাপনায় কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বইয়ের নাম 'ছড়ার ছবি' দিলেও সে-বইয়ের সব লেখাই কবিতা। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এর বেশির ভাগ লেখা সম্পর্কেই এ-কথা বলতে হয়। যে কবিতার নামে বইয়ের নামকরণ সে-লেখাটিও চমৎকার একটি কবিতা। আধুনিক বাংলা কবিতা-র সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে আপাতভাবে ছড়াকার সুকুমার রায়কেও কবির মর্যাদায় স্থান দিতে হয়েছিল। সংকলিত হয়েছিল সুকুমারের একাধিক কবিতা। হ্যাঁ, 'আবোল তাবোল' নামের কবিতাটিও গ্রন্থিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু ঠিক কাজই করেছিলেন। তিনি নিজেও ছোটদের জন্য ভালো কবিতা লিখতেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীও ছড়া নয়, ছোটদের জন্য কবিতাই লেখেন। রাশি রাশি ছোটদের কবিতা কখনও লেখেননি, অল্পই তাঁর কবিতার সংখ্যা। দু'টি মাত্র তাঁর কবিতার বই। ছোটদের জন্য লেখা ক্ষীণতনু বই দু'টির কবিতা নিছক হাস্যরসাত্মক নয়, রয়েছে সময়ের ছায়া, সমাজের চিত্রমালা। রয়েছে ছোটদের মনের উন্মুক্ত অন্দরমহল। লক্ষ করা যায়, এই সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাদের সচেতন করার প্রয়াসও। এসব এসেছে অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে। শিল্পের সঙ্গে ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্ততার আশ্চর্য সমীকরণ। কখনওই তা বানানো, আরোপিত মনে হয় না। একেবারে অন্যরকম কবিতায় ছোটরা কথা বলে এভাবে, 'আমি আর আমার বন্ধু ঋষি/জমিয়েছি একগাদা শিশি।/কী করব এত শিশি দিয়ে?/চল ভরি গে' শিশির দিয়ে।/শিশির দিয়েই বা করব কী?/স্নান করব— হি হি হি।' একগাদা শিশিতে শিশির ভরে স্নান করার এই ভাবনাটি শুধু অভিনব নয়, অভূতপূর্ব।

ছোটদের মন কল্পনাপ্রবণ। তাদের রংবাহারি মনের আনাচে কানাচে এমন ভাবনা যদি উঁকি মারে, তাতে বোধ হয় অবাক হওয়ার কিছু নেই। একচিলতে ছোট্ট একটি

লেখা, ভিজুয়ালাইজেশনের যুগে ছোটদের কল্পনা করার ক্ষমতা মরেহেজে যাচ্ছে, এই কবিতাকণিকা তাদের মনের কোণে ঘুমিয়ে থাকা কল্পনা-ক্ষমতাকে নতুন করে উদ্দীপিত করবে, জাগিয়ে তুলবে। উল্লিখিত কবিতাটি একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এমন কবিতা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী আরও অনেক লিখেছেন। ছড়িয়ে রয়েছে 'তালগাছের ডোঙা'-য় ও 'জল বাতাসা'-য়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কোনও কোনও কবিতা পড়তে পড়তে মনের ভেতর হু-হু করে ওঠে। মন খারাপ হয়ে যায়। ছোটদের কবিতায় ভাগ বসানো বড়রাও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সে-বাল্য-কৈশোর আর নেই। দ্রুত শহর-শহরতলির এমনকী মফস্বলেও ছোটরা বদলে গেছে। কী ভালোই না হতো, সত্যিই যদি তারা এমন করে বলতো, 'ভালোবাসি কালবোশেখে আম কুড়োবার সঙ্গীকে। /শরৎকালের নীল আকাশে মেঘ চরবার ভঙ্গিকে।/ভালোবাসি লতাপাতার গন্ধটাকে। ভালোবাসি ফুল ফোটানো গাছের মাকে।/ভালোবাসি অচিন পাখির ডাকের ছন্দ।/ভালোবাসি অচেনা ফুলের অবাক গন্ধ।'

মন ভালো করার কবিতা, মন খারাপ করার কবিতা। কখনও আনন্দমুখর, কখনও বিষাদ-মলিন। আনন্দরই হোক বা বিষাদের, যা-ই হাক না, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা আমাদের স্পর্শ করে। সহজ ভঙ্গিতে, অনায়াসে প্রায়শই কত বড় কথাই না তিনি বলেন তাঁর কবিতায়। লোকায়ত ছড়ার মিশেল ঘটিয়ে কি অপূর্ব তাঁর উচ্চারণ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন, 'অনেক লম্বা কচুবন আর শেয়ালকাটার ঝোপ/পেরিয়ে অন্ধ বাঁশজঙ্গল ফুঁড়ে/আমার নিজের কতই রাস্তা ছিল—/কে কেড়েছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল/তাইতে আমার শরীর খারাপ, ভাত খাইনি কাল।'

সহজ কথা তো সহজ করে বলা যায় না! শক্ত কথাও কি সহজ করে বলা যায়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী পারেন। তাঁর কথা বহুদূর পরিব্যাপ্ত হয়, ছড়িয়ে পড়ে নিমেষে। 'জল-বাতাসা' বইটিতে জাপানি হাইকুসদৃশ্য দু'লাইনের ছড়া আছে। সেটি এরকম, 'সবাই ছিলাম ভাই-ভাই/এক উঠোন আর এক নাই।' কী প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ। রূঢ় সত্যের এই সহজ-উচ্চারণে বিস্মিত হই। কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে।

চারদিকে সবুজের ধ্বংস চলেছে। গাছগাছালিময় জঙ্গল সাফ করে নগর পত্তন হচ্ছে। উঠছে কংক্রিটের জঙ্গল। প্রাণঘাতী আমাদের এই আহাম্মকির বিরুদ্ধে কী সহজ করে, স্পর্শময় ভাষায় 'তালগাছের ডোঙা' বইটিতে তিনি লেখেন, 'গাছের মা গাছের বাবা গাছের ভাইবোন—/ছোটকা-মাসি-ঠাম্মা-পিসি নিয়েই আস্ত বন। /তাছাড়া গাছ মস্ত গুণী।/সে-গাছ যারা কাটে, গাছ হটিয়ে দু-দশতলা বাড়ি বানায় ঠাঁটে—/তারা মানুষের কেউ না, তারা খুনী।/হাত-পা-বাঁধা অসহায়/গাছকে মেরে গাছ কাঁদায়—/কুড়ুল-করাত লোকলস্কর নিয়ে এলেন উনি।/অক্সিজেন জোটাচ্ছে কে শুনি?'

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী গম্ভীর কথা সহজ করে বলেন, ছোটদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে, সব সময়ই যে এমন ঘটে, তা নয়। 'বকচ্ছপ' নয়, 'ঘোবড়াল'-এর সন্ধান দিয়েছেন তিনি। নিঃসন্দেহে তা উপভোগ্য। লিখেছেন, 'এক দেশে এক ঘোড়া ছিল, বেড়াল হতে চাইল/কেউ জানে না কোত্থেকে তাঁর গোঁফ জোড়াটি পাইল।/খানিকটা

তার রইল ঘোড়া, মুণ্ডটা তার বেড়ালমুখী,/জানে না আর সে কি এখন দুঃখী, নাকি সত্যি সুখী।' মজায় মজানো, উপভোগ্য দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তেমনই একটি, 'পকেটে তো নেই খুচরো/গেলাম না আর চুঁচড়ো।' এটি 'এক' সংখ্যাঙ্কিত। 'দুই' সংখ্যায় চিহ্নিত পরের ছড়া-টুকরোয় লিখেছেন, 'সকলেরই দেখি বড্ড রাগ/তাই যাব না আরামবাগ।'

আরামবাগে নাই যাওয়া হোক, আমরা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছড়ার জগতে ঘুরেফিরেই যেতে চাই। তাঁর ছড়া-কবিতা পড়ে সত্যই বড় আরাম হয়! প্রাপ্তির আনন্দে মন ভরে ওঠে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছন্দের হাতটি কতখানি সজীব ও সপ্রাণ তা তাঁর 'হীরু ডাকাত' ফিরে পড়তে গিয়ে আবারও অনুভব করা গেল। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে ছবি লেখেন তিনি। ডিটেলের কারুকাজে মুগ্ধ হতেই হয়! ছন্দোবদ্ধ এ-আখ্যানের বুনোটে রয়েছে নৈপুণ্য, যা চুম্বক-আকর্ষণে ছোটদের ধরে রাখে। শুধু ছোটদের বলি কেন, পুনঃপাঠে এই কলমচিও প্রথম-পাঠের আনন্দ পেয়েছে। ঘটনার ঘনঘটায় এমন টানটান রচনা গদ্যে নয়, পদ্যেও যে সম্ভব, তা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীই প্রথম দেখিয়েছেন। পরেও কি কেউ দেখাতে পেরেছেন! তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। 'হীরু ডাকাত'-এ লক্ষ করা যায়, কাহিনির গোড়া থেকেই অমোঘ আকর্ষণ, উত্তেজনা। উত্তেজনার পারদ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক এ-কাহিনির সূচনা হয়েছে এভাবে, 'আমবাগানের ছায়ায় তিনটে ছেলে/এই ছুটছে গাছে উঠছে, দিচ্ছে ঠেলে ফেলে/গাছ থেকে তার সঙ্গীকে আর হাসছে হাহা হিহি/হঠাৎ দূরে ঘোড়ার চিঁহি-হি/শুনেই তারা চুপ।/ঠিক যেখানে প্রাচীন রাজার বাড়ির ধ্বংস্তূপ/ভাঙা দেয়াল, ঝোপঝাড় আর অশত্থগাছে ঘেরা/দৌড়ে গিয়ে সেইখানটায় লুকায় বালকেরা।/টগবগ টগ টগবগ টগ ক্রমেই আসছে কাছে/কী সর্বনাশ! একটা তো নয়, আর কি রক্ষা আছে?' আতঙ্ক-জাগানিয়া খুরের শব্দে সবাই তখন ভয়ে কাঠ। খুরের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসে। এমনতরো নাটকীয় সূচনায় বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়, ক্রমেই তা বাড়ে। হোক না সে ডাকাত, তবুও তাকে মন্দজন মনে হয় না। হীরুর মানবিকতার কথা, সহৃদয়তার কথা জানার পর সেও হয়ে ওঠে আমাদের ভালোবাসার জন। এক সময় বাংলায় ডাকাতের অভাব ছিল না। বাংলার সে-সব ডাকাতের গল্প লিখে রেখেছেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বানানো, কল্পনার ডাকাতের গল্প নয়, সত্যিকারের ডাকাতেরা ছিল নানা গুণে গুণান্বিত। দানবিক নয়, মানবিক। হীরু সেই ডাকাতদের প্রতিনিধি হলেও উপস্থাপনগুণে পেয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। হীরুর পা রয়েছে বাস্তবের মাটিতে, কল্পলোকের নিছক গল্পকথা নয়, সে-ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, এ সব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশশো ন সাল।

আপাতভাবে দুর্ধর্ষ, যা-খুশি করে বেড়ায়। প্রবল প্রতাপ, তাই 'সবাই কাঁপে হীরু ডাকাতের নামে'। যতই তাকে ভয়ংকর মনে হোক না কেন, আসলে তেমন নয়। বার বার ভেতরের মানুষটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ফুটে থাকা এক সামান্য ফুল দেখে তার হৃদয় চঞ্চল হয়েছে। ভেতরের মানুষটি জেগে উঠেছে 'আহা কী সুন্দর ফুটেছে দোপাটি।' এমন অনেক ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষটিকে

চিনে নেওয়া যায়। পরিচয় মেলে তাঁর কোমল অন্তঃকরণের। ডাকাত বলে তার প্রতি ভুলেও বর্ষিত হয় না ঘৃণা, বরং জাগ্রত হয় সহমর্মিতা। যেভাবে সে অত্যাচারিত মানুষের পাশে গিয়ে সদলবলে দাঁড়িয়েছে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তার তুলনা হয় না! যৌতুকপ্রত্যাশী বরপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের কাছে ঢিট হয়েছে। বেঁচেছে কন্যাদায়গ্রস্থ বিপন্ন পিতা। এটা কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, এমনটি বার বার ঘটেছে। শুধু প্রেক্ষাপট পাল্টেছে, ঘটনার পর ঘটনা, শেষে মধুরেণ সমাপয়েত, মূর্ত হয়ে উঠেছে হীরুর মানবিকতা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযানে এই চেনা হীরুকেই আমরা ঘুরেফিরে পেয়েছি। প্রথম অভিযান পড়তে পড়তে যে মুগ্ধতা, দ্বিতীয় অভিযানে তা কমেনি বরং বেড়েছে। টানটান উত্তেজনায় গতি পেয়েছে আখ্যান। দ্বিতীয় অভিযানের মুগ্ধতা নিয়ে তৃতীয় অভিযান পড়তে শুরু করে বার বারই মনে হয়েছে, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কেন এটিকে 'শেষ অভিযান' বলেছেন! কেন লেখেননি চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ... একের পর এক এমনতরো অভিযানের বিবরণ। পরে মনে হয়েছে, ছোটদের সাহিত্য দুনিয়ায় সচরাচর যা ঘটে থাকে, সত্যিই যদি তেমনটি হতো, তবে ব্যাপারটি লঘু হয়ে পড়তো। পুনরাবৃত্তি ও একঘেয়েমিতে হীরু ডাকাতকে ঘিরে যে কৌতূহল, কাহিনি-বুনোনে যে জৌলুস, সেসবও ফিকে হয়ে যেত। না, সে-ভুল করেননি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। বেদনায় বিষন্নতায় কঠিন সত্যটিকে আমরা মেনে নিয়েছি। আশ্রিত আকস্মিক হয়ে উঠেছে আততায়ী। তৃতীয় অভিযানের সাফল্যে তখন হীরুর মেজাজ ফুরফুরে, রং লেগেছে মনে। ভেবেছে, 'ছোট্ট একটা কাজ রয়েছে, সেটা সেরেই বেরিয়ে পড়ব দূরে/পৃথিবীটা দেখব একটু ঘুরে...।'

বিষণ্নতা গ্রাস করে, হীরুর মৃত্যু আমাদের শোকাহত করে। হীরুর গুণপনা অনুরণিত হতে থাকে। মানবিকতায় উজ্জ্বল এ অ্যাডভেঞ্চার আমাদের চিরায়ত শিশুসাহিত্যের যে ধারা, সে ধারারই অনুসরণকারী। রক্ত, বন্দুকের গুড়ুমগুড়ুম নেই, সহজেই ছোটদের মনে শুভবোধ জাগায়, চেনায় আলো-অন্ধকার। আজকের ছোটরা বদলে গেলেও 'হীরু ডাকাত'-এ চিরায়ত শিশুসাহিত্যের যে চেনা সুর শোনা গেছে, তা তাদের কাছেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। বইটির একের পর এক সংস্করণ আমাদের আশ্বস্ত করে। রবীন্দ্রনাথ জল-মেশানো শিশুসাহিত্য নিয়ে একদা খেদোক্তি করেছিলেন। না, 'হীরু ডাকাত'-এ জল নেই।

সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে জল মেশানোর অপচেষ্টা নেই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কোনও লেখাতেই। 'হীরু ডাকাত'-এর মতোই জনপ্রিয় তাঁর 'শাদা ঘোড়া' বইটি। প্রথমদিকে 'শাদা ঘোড়া' বইটির সঙ্গে 'ঋষিকুমার'কেও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ণেন্দু পত্রী চিত্রিত ছোট সাইজের সেই আনন্দ-সংস্করণটি বড়ই মনোরম ছিল। এখন দু'টি আখ্যান নিয়ে দু'টি পৃথক বই হয়েছে।

'শাদা ঘোড়া' বড় মায়াবী এক রূপকথা। রূপকথার চেনা সুর হয়তো নেই, থাকবেই বা কেন, রূপকথাকেও তো আধুনিকভাবে আলোয় আলোকিত করা উচিত। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কলমেও তেমনই ঘটেছে, পেয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। কোথা থেকে, কীভাবে পাওয়া গেল বিস্ময়জাগানিয়া এই শাদা ঘোড়াটিকে। গল্পকথক জানিয়েছেন, 'আমার একটা শাদা ঘোড়া আছে। গত বছর বর্ষাকালে আমি মাতলাগাঙের ওপারে

গিয়েছিলাম, সেখানে মাঠের মধ্যে একটা খাদ থেকে আমি ঘোড়াটিকে নিয়ে আসি। ওর তখন ছ-মাসও হয়নি। ঘোড়াটা খাদের মধ্যে পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল।' সেই শাদা ঘোড়াকে নিয়ে কত ঘটনামালা, শেষে পরম প্রাপ্তি! রূপকথায় যেমন হয়, রূপবতী রাজকন্যেলাভ। কপালে টিকলি, পরেছে লাল বেনারসি, টুকটুক নামের সেই রূপসীকন্যাকে তখন সত্যিই রাঙা টুকটুকে দেখাচ্ছিল! বর পেয়ে ভারি খুশি সে, রানিমা যখন জিজ্ঞাসা করছেন, 'কী টুকটুক, খুশি তো?' তখন মাথা কাত করে সে বলেছে 'হুঁ-উ'।

শব্দ-তুলিতে ছবি যেন! ঘটনার পর ঘটনা সবই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই বাদ যায় না। 'হুঁ-উ' বলার সময় মাথা কাত করায় তার কপালের টিকলি যে একপাশে হেলে পড়েছে, তাও নজর এড়িয়ে যায়নি। এমনতরো কত না বর্ণনা রয়েছে, যা সহজেই ছোটদের চোখ খুলে দেয়। জীবনে যত রং লাগুক, দেখি, গল্পকথক ফিরে যায় হারানো আমি-র কাছ। আত্মবিশ্লেষণ তো সারা কাহিনিতেই আছে, শেষে আত্মসন্ধান! এইভাবে শেষ হয়েছে মন-কেমন করা এ-আখ্যান, 'আমি টুকটুককে নিয়ে রোজ শাদাপালের পিঠে চড়ে বেড়াতে যাই, আর এক-একদিন, যেদিন কেন জানি না, সকাল থেকেই আমার খুব মন কেমন করে, সেদিন দূর মাঠে গিয়ে বিরাট আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আপন মনে বাঁশি বাজাই।'

'ঋষিকুমার'-এও রয়েছে আকুল করা বাঁশির সুর। সেই সুর শুনে ঋষির মনে হয়েছে, 'সকালবেলার আকাশও আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে।' এই সুর হারানোর নয়, অনুরণিত হতেই থাকে। সঞ্চারিত হয় মন থেকে মনান্তরে, আমাদের মনেও। মায়ের কাছে পৌঁছনোর প্রাকমুহূর্তে 'ঋষির হঠাৎ কিসের আনন্দে মন ভরে গেল, আর তখনই তার দুম করে মনে পড়ে গেল— সকালবেলায় আকাশ আজ সেই বাঁশিওলার বাঁশির সুরের মতন। বাড়ি পৌঁছে, কেউ তাকে কিছু বলবার আগেই ঋষি কঞ্চির কলমটা দেখিয়ে মাকে বলল, 'এই দেখো মা, আমার কলম।'

বাঁশির সুরে সুরে আকাঙ্ক্ষাপূরণের এ-আখ্যান ছোটদের তো বটেই, ভালো লাগবে বড়দেরও। কংক্রিটের নগরসভ্যতায় বড় হওয়া ছোটরা মনে মনে ঋষি হতে চাইবে। এমন জীবন তো তারা দেখেনি। মনে হবে, তারও যদি এমন জীবন হতো। ভীষণ নীল আকাশে ধবধবে শাদা আলপনার মতন এক সারি বকের উড়ে যাওয়া দেখত। সেই বকের সারিতে হয়তো মিশে থাকত তারও ভালোবাসার বক। বেদেপাড়ার একটা লোককে আংটিটা দিয়ে ফিরে পাওয়া বকটার জন্য তারও বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠত, হাউ-হাউ করে কাঁদত। পড়তে পড়তে মনে মনে কেউ কেউ নিজেও ঋষি হতে চাইবে। না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। বড়ই মন-ছোঁয়া লেখা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কোনও বই-ই পৃথুল নয়, গল্পের সংকলনগুলিও ক্ষীণতনু। আকারে বড় না হলেও প্রকারে বড়। বরাবরই বড় দায়িত্ব পালন করে। বড় কথা বলে। মানুষ চেনায়, জীবন চেনায়। 'মাতলাগাঙের ভূত', 'লিচুবাগানের চৌকিদার', 'ছেঁড়াকাঁথার গল্প' বা 'ভূতের বাঁশি'— কোনওটিই বৃহদায়তনের নয়, রোগাভোগা! হোক না ক্ষীণতনু, গল্প পড়তে শুরু করলেই তৈরি হয় মুগ্ধতা, অদ্ভুত এক ভালো-

লাগা ছড়িয়ে পড়ে মনের অলিতেগলিতে। বিকোয় ভালো, ছোটদের বাজারচলতি সাহিত্যের থেকে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অবস্থান যে শত যোজন দূরে, তা উল্লিখিত বইগুলিতে সংকলিত গল্পসমূহে আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরতে পরতে জীবন দেখার অভিজ্ঞতা। বৈভবের বিলাসী-জীবন নয়, মাটির কাছাকাছি মানুষজনই ঘুরেফিরে এসেছে। খেজুররসের সংগ্রাহক শিউলি, লিচুবাগানের চৌকিদার বা জেলেজীবন— কী নেই, কারা নেই তাঁর গল্পে! অভাবী মানুষের দিনযাপন, তাদের দুঃখের বারোমাস্যার আন্তরিক বিবরণ পড়তে পড়তে ছোটরাও ওইসব রিক্তজনের জন্য কাতর হবে, মনে জাগবে সহমর্মিতা। ছোটরা হৃদয়বান হয়ে উঠুক, আমরা সকলেই চাই। মানুষ কত কষ্টে আছে, এই বাস্তব সত্যটিকে তাদের জানানো জরুরি! অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বুঝিয়ে দিয়েছেন দারিদ্রের মধ্যেও লুকোনো মাধুর্য আছে। গল্পে গল্পে তিনি সেই মাধুর্যেরই সন্ধান দিয়েছেন। তাই ঘুরেফিরেই তাঁর গল্পে এসেছে মানুষের কথা। রয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশ। জীবজগতের প্রতি ভালোবাসা জাগানোর, সখ্য তৈরিরও প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ক্ষুদ্র বুলবুলি থেকে বৃহৎ হাতি, তাঁর গল্পে বাদ যায়নি কিছুই। ভূতের গল্পও লিখেছেন কয়েকটি। কোনওটিই চেনা-ছকের গল্প নয়। 'মুড়োহাসা গ্রামে', 'ভূতের স্নেহ' বা 'বিদ্যাধরী বাসন্তী বিদ্যালয়' তাঁর অন্যরকম ভূতের গল্প। ছমছমে থমথমে ভয়-জাগানো হাড়-হিম করা গল্প নয়। এমন গল্প অনেকেই লেখেন। হোক না ভূতের গল্প, অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সেসব গল্পের পরতে পরতে রয়ে যায় স্নিগ্ধতা। ভূতও যে ভালো বন্ধু হতে পারে, তা জানার পর মনে খানিক স্বস্তি জাগে, আশ্বস্ত হই। 'মাতলাগাঙের ভূত' নামে তিনটি ভূত-গল্প নিয়ে যে বই, সে-বইয়ের গল্পে ভূতের কথা আছে সত্যি, তা সত্ত্বেও বলতে হয়, ভূত-ভয় নয়, মুখ্য হয়ে উঠেছে সোঁদরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামজীবনের ছবি। জল-জঙ্গলের সে-জীবনে প্রতিকূলতা প্রতি পদে, আবছা-ঝাপসা বা একেবারেই ধারণা না-থাকা হতদরিদ্র মানুষের জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কে ছোটদেরও একটা ধারণা তৈরি হয়।

'আমাজনের জঙ্গলে', 'গরিলার চোখ', 'গোবিমরুভূমির গুপ্তধন', 'বরফের বাগান', 'চাঁদের তাঁবু', 'দুরুদুরু'... অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রতিটি উপন্যাসই বৈচিত্র্যে ভরপুর। কোন্‌টি ছেড়ে কোনটির কথা বলি। 'আমাজনের জঙ্গলে' পড়তে পড়তে দূর-দেশের বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পৌঁছে যাওয়া যায় অনায়াসে। আবার 'বরফের বাগান' পড়তে পড়তে বরফ-সাদা আন্টার্কটিকায় মানসভ্রমণ হয়। হারিয়ে যেতে নেই মানা, মনে মনে। ভাবতেও ভালো লাগে, ছোটদের উপন্যাসের চেনা জগৎ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর হাত ধরে বিস্তৃত হয়েছে। দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতা অবশ্য কখনও মুখ্য হয়ে ওঠেনি। অভিজ্ঞতার প্রাধান্যে উপন্যাস তার মেজাজ হারায়নি। 'আমাজনের জঙ্গলে' উপন্যাসটিতে উবার কথা, আমাজন নদীর কথা— পাতায় পাতায় যেন রহস্যময় এক অজানা জগৎ। জানা হয়ে যায়, 'বনদিয়া' মানে গুড ডে অর্থাৎ শুভ দিন, 'ওব্রিগাদো' মানে থ্যাঙ্ক ইউ, ধন্যবাদ। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনার পাশাপাশি নতুন এক দেশকে জানার আনন্দ, দেখার আনন্দ— সব আনন্দ মিলেমিশে বুঝি একাকার হয়ে যায়।

তুষাররাজ্যে সেই দূরের আন্টার্কটিকাতেও আমাদের নিয়ে গিয়েছেন অমরেন্দ্র

চক্রবর্তী। সাজানো বাগান নয়, 'বরফের বাগান'। সে-বাগান উত্তেজনায় ভরপুর। রয়েছে বিপদের আশঙ্কাও। ড্যাঙ্কো, নেকো, কুভেরভিল— দ্বীপে দ্বীপে শত শত পেঙ্গুইন দেখার উত্তেজনা কি কম! বইটি হাতে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলতে হয়!

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্য উপন্যাসগুলিও এমনই টানটান। রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় ভরপুর। একবার শুরু করলে ছাড়া যায় না। অমোঘ আকর্ষণে বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে যেতে হয়। 'চাঁদের তাঁবু', 'গোবি মরুভূমির গুপ্তধন' বা 'দুরুদুরু'— তাঁর সব উপন্যাসেরই এমন অমোঘ আকর্ষণ। রয়েছে অভিজ্ঞতার আশ্চর্য বিবরণ। পড়তে হয়েছে মরুভূমিতে সাংঘাতিক ঝড়ের মুখোমুখি। যেতে হয়েছে কখনও কুয়াশাঘেরা দ্বীপে, কখনও বা জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে। অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজ যতই তীব্র হোক, যতই উত্তেজনা-শিহরণ থাকুক, রয়ে গেছে জীবনের উত্তাপ। বলা যায় জীবনবোধে ঋদ্ধ। এই জীবনবোধ গভীর থেকে হয়েছে গভীরতর। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বরাবরই, কি ছড়া-কবিতায়, কি গল্প-উপন্যাসে ছোটদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, তাদের আলোয় ভালোয় নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

লেখক পরিচিতি

অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য ডক্টরেট, ছড়ার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে ডি-লিট। শিশুসাহিত্যসেবী। ছোটদের জন্য লিখেই আনন্দ পান বেশি। শিশুসাহিত্যের গবেষকও। পুরনো সাময়িকপত্র সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু। ঠাকুরবাড়ি নিয়েও কৌতূহলী। বাংলা সাহিত্যের বহু হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের অমুদ্রিত গ্রন্থ 'স্বপ্নের মোড়ক'-এর আবিষ্কারক। বাংলা ভাষার প্রথম বার্ষিকী 'পাবণী' ও গগনেন্দ্রনাথের 'ভোঁদড় বাহাদুর'-এর আদি-পাঠ 'দাদাভায়ের দেয়ালা' খুঁজে পেয়েছেন। সাময়িক পত্রের ইতিহাস-রচনার পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ি নিয়েও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়— কলকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীতে আমন্ত্রিত হয়ে রিফ্রেশার্স কোর্সে পড়িয়েছেন। ছোটদের জন্য অন্তত পঞ্চাশটি বই লিখেছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদিত-গ্রন্থ সংখ্যায় একশো ছাড়িয়েছে। রাজ্য সরকারের শিশুকিশোর আকাদেমির কর্মপরিষদ-সদস্য।